১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধ অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের চরিত্র আলোচনা করো।

অথবা,

। 'বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণ বাঙালি চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।'—সাধারণ বাঙালি-চরিত্রের তুলনায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অনন্যতার পরিচয় দাও।

অথবা,

। 'এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে।'—লেখকের বক্তব্য অনুসরণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্বরূপ বিচার করো।

অথবা,

। 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ' —বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক লেখকের এই মন্তব্যের যথার্থ্য নিরূপণ করো।

উত্তর। বাঙালি জাতির মধ্যে ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী চরিত্রের আবির্ভাব যথার্থ বিস্ময়ের ব্যাপার। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বহুমাত্রিক সার্বিক পরিচয় উদ্ধার করেছেন। এই মহাপুরুষের চরিত্র এতো বিরাট ও মহৎ

যে, সাধারণ বাঙালির তাঁর নামোচ্চারণেরও অধিকার নেই বলে তিনি মনে করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের বিপরীত 'বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ' বলে তাঁর মনে হয়েছে। আমাদের দেশে যাঁরা খুব বড়ো বলে পরিচিত ও পরিগণিত, তাঁদের সামনে বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত ধরামাত্র তাঁরা নেহাৎ ক্ষুদ্র হয়ে পড়েন এবং আমাদের গর্বের 'বাঙালিত্ব'ও নিয়ে 'ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। আমাদের 'চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে। কাহারও সাধ্য নেই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম বা স্পর্শ করে।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে 'বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কীরূপে উৎপত্তি হইল', লেখকের কাছে তা বিষম বিস্ময় রূপে গণ্য হয়েছে। বিদ্যাসাগরের দুর্দম প্রকৃতি—যা ভাঙতে পারে, কখনও নোয়াতে পারে না; তাঁর উগ্র পুরুষকার, যা সহস্র বাধা-বিঘ্ন ঠেলে ফেলে নিজেকে অব্যাহত রাখত; তাঁর উন্নত মস্তক, যা ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের কাছে অবনত হয়নি; তাঁর 'উৎকট বেগবতী ইচ্ছা', যা সমস্ত প্রকার কপটাচার থেকে ছিল মুক্ত—বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। বাঙালি-চরিত্রে এই সমস্ত গুণাবলি—যথা, মেরুদণ্ডের সরলতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদাবোধ, পুরুষকার প্রভৃতির একান্ত অসদ্ভাব বলে অনেকে তাঁর চরিত্রে 'পাশ্চাত্যজাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন।' লেখকও বলেছেন—'**পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যা বর্তমান, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল।**' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লেখক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই সমস্ত গুণ আদৌ ইউরোপীয় চরিত্রের প্রভাবসঞ্জাত নয়, হয় তাঁর স্ব-অর্জিত নতুবা পিতাপিতামহের কাছ থেকে জন্মসূত্রে লব্ধ। বাল্য-কৈশোর জীবনটা বিদ্যাসাগরকে কাটাতে হয়েছিল দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে। শুধু বাল্য-কৈশোর কেন, তাঁর সমগ্র জীবনটাই পরের জন্য সংগ্রাম করে কেটে যায়। এই সংগ্রাম তাঁর চরিত্রগঠনে অনেকখানি আনুকূল্য করেছিল, অন্যদিকে পিতাপিতামহের কাছ থেকে 'ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে'। তিনি এ বস্তু লাভ করেছিলেন। বাঙালির সঙ্গে চরিত্রগত অতুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন।' তিনি জন্মেছিলেন খাঁটি বাঙালির ঘরে; তাঁর বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুমাত্র অনুভব করেননি। তিনি যে স্থানে এবং যাঁদের মধ্যে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে স্থানে ও তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশই করেনি। পরবর্তী জীবনে কর্মজীবনে তিনি অনেক ইউরোপীয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন বটে, কিন্তু ততোদিনে তাঁর চরিত্রে পুরোপুরি গঠিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধে গরীয়ান ও সমৃদ্ধ এই মহাপুরুষের নিজস্ব মতো এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণের কোনো প্রয়োজন তিনি কখনও উপলব্ধিই করেননি। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছেদে অনুকরণপ্রবণতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলে তিনি প্রচণ্ড অভিমান ও দর্পে যেন প্রতিবাদ জানানোর জন্যই আজীবন ধুতি ও চটিজুতা ব্যবহার করেছেন। তাঁর আত্মসম্মানবোধ, স্বজাত্যবোধ এবং স্বজাতীয় পরিচ্ছেদের প্রতি আসক্তিবোধ ছিল অতুলনীয়। তিনি মুটের মাথা থেকে বোঝা কেড়ে নিয়ে নিজের মাথায় তুলে পথ চলেছিলেন যে অভিমান ও দর্পে, সেই দর্পের বশেই চটিজুতা পরিধান করেছেন এবং উচ্চ-নীচ সাধারণ-অসাধারণ সকলের সম্মুখ দিয়ে বীরদর্পে চলে গেছেন।

আচার বিষয়ে যেমন তিনি অনুকরণ করতেন না, তেমনি লোক-হিতৈষণার ব্যাপারেও তিনি কখনও অনুকরণ করেননি। তাঁর লোক-হিতৈষণা ইউরোপীয়দের লোক-হিতৈষণার মতো 'ব্যক্তিগত স্ফূর্তি' ও 'নিজত্বের অভিব্যক্তি' ছিল না। অর্থাৎ তিনি ফিলানথ্রপিস্ট ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের লোক-হিতৈষণা ছিল সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। এই লোক-হিতৈষণা নীতি-ধর্ম-অর্থ-সমাজ-শাস্ত্র—কোনো

শাস্ত্রেরই তোয়াক্কা করত না। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা, আর্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করা—এ-সমস্ত কাজে বিচার-বিশ্লেষণ, কারণ অনুসন্ধান,—এ-সবের কিছুই প্রয়োজনবোধ করতেন না বিপদ দুঃখ অভাব দেখলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং প্রাণ দিয়ে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করতেন। এধরনের লোক-হিতৈষণা বা মানবপ্রীতি সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাপার।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে রোদনপ্রবণতা দেখা যায় তা-ও সম্পূর্ণ প্রাচ্য আদর্শের ভিত্তিতে। 'বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।' কোনো দীনদুঃখী, কোনো বালিকা বিধবা তাঁর কাছে এলে তাঁর বুকের মধ্যে করুণাগঙ্গা প্রবাহিত হতে থাকত, ভ্রাতা বা কন্যার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি বালকের মতো উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকতেন। আসলে 'বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল' ছিল।

ঈশ্বর ও পরকাল সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কোথাও তাঁর মতামত বা মনোভাব ব্যক্ত করেননি। পৃথিবী জুড়ে মানুষের অসীম দুঃখকষ্ট দেখে মঙ্গলময় ঐশী সত্তায় হয়ত তাঁর বিশ্বাস টুটে গিয়েছিল। অনাদির মানুষই ছিল তাঁর একান্ত উপাস্য, 'জীবন্তদেবে'র সেবাই ছিল ঈশ্বরসেবা। পিতামাতাকে তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। তাঁর কাছে কর্তব্যই ছিল সবচেয়ে বড়ো ধর্ম।

বিদ্যাসাগরের আর এক পরিচয় তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক। তিনি নিজে বলেছেন—'বিধবাবিবাহে পথপ্রদর্শন তাঁহার জীবনে সর্বপ্রধান সৎকর্ম'। বস্তুত এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা তাঁর সমগ্র মূর্তিটি দেখতে পাই। বালবিধবার দুঃখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়ে করুণা-মন্দাকিনী ধারা হয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটেছিল। দেশাচারের প্রবল প্রতিরোধ সেই প্রবাহ রুখতে পারেনি। কোমলতা ও কঠোরতা—বিদ্যাসাগরের এই দ্বিবিধ মূর্তিই আমরা বিধবাবিবাহ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

বিদ্যাসাগরের পূত চরিত্রের একটি অপ্রতিম আলেখ্য রচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বর্তমানে ক্রমক্ষীয়মাণ বাঙালি জাতির সামনে একটি জাজ্বল্যমান আদর্শ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। একমাত্র বিদ্যাসাগর-চরিত্রের আদর্শই 'দগ্ধাস্থিপিঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির নূতন জীবনসঞ্চার' করতে পারে বলে পণ্ডিত মনীষী লেখক যে সিদ্ধান্ত করেছেন, সম্ভবত তা অমূলক নয়।